Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-III, April 2025, Page No. 98-103
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নারী ক্ষমতায়ন : সাক্ষী মহাভারত

ড. ব্রততী চক্রবর্তী, *সহকারী অধ্যাপিকা, সংকৃত বিভাগ, টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.04.2025; Accepted: 29.04.2025; Available online: 30.04.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In present day 'Women Empowerment' is most discussed issue in society. In our patriarchal society women are known as the second gender. The goal of women empowerment is to create equality between men and women by improving women's overall conditions. By empowering women, they are able to control their own lives as well as to make decisions on social, political and economic issues of society. At the present time this attitude is quite realistic but thousands of years ago the concept of equality and empowered women is noticed in our literature. In Mahabharata many educated and empowered women are found. But amongst them 'Satyabati' is the special character who controlled the whole Mahabharata. Satyabati's Character represents that, in that era women had a clear understanding of their rights and their duties. In a very short portion of Adikanda of Mahabharata the story of Satyabati is introduced. But its impact is widespread. At first Satyabati is known as Dhibarkanyya in her early life but later she became the Rajmata of the Kuruvamsha. The whole story of Mahabharata is controlled by her. The decisions made by her in various crucial situation like marriage of Vichitravirya, the Niyoga system etc are indicate her efficiency of decision making and modern broad thinking also.

Keywords: Women empowerment, Mahabharata, Satyabati, Power of decision making, modern thinking.

'ক্ষমতায়ন' বা 'Empowerment' সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম চর্চিত বিষয়। ক্ষমতায়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনও ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী তাদের সামাজিক পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য নিজেদের শক্তি, দক্ষতা ও সম্ভাবনা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়।[১] সমাজে বৈষম্য ও বঞ্চনার স্বীকার হওয়া মানুষ ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন নিজের জীবনকে নিজে নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষমতা অর্জন করে, তেমনি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণের যোগ্যতাও অর্জন করে। এই 'ক্ষমতায়ন' শব্দের সাথে যখন 'নারী' শব্দটি যুক্ত হয়ে যায়, তখন বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী নিজের জীবন ও পারিপার্শিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ও সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকার প্রায়শই নারীদের থাকে না। নারী ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে তাই বলা হয়েছে—"Women empowerment may be defined as a process by which the powerless gain greater control over the circumstances of their lives". তাই ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধি এক সুস্থ স্বাভাবিক প্রগতিশীল সমাজের জন্য একান্ত কাম্য। বর্তমান সময়ে নারীর ক্ষমতায়ন বা সশক্তিকরণ বিষয়টি সুবিদিত ও ব্যাপকভাবে চর্চিত। নারী পুরুষ উভয়েই এ বিষয়ে কমবেশি সমমনস্ক। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরে নারীর পিছিয়ে পড়া অবস্থাকে উন্নীত করতে, সমাজের দ্বিতীয়লিঙ্গরূপ তকমার আড়ালে লুকিয়ে থাকা স্বাধীনসত্তাকে পূর্ণবিকশিত করতে 'নারীর ক্ষমতায়ন' আজ বহুজনকাঙ্ক্ষিত একটি বিষয়। নারী ও পুরুষ এই দুয়ের মধ্যে সমতাবিধান বা সাম্যপ্রতিষ্ঠাই এর লক্ষ্য। প্রত্যেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবিষয়ে যত্নশীল। এমনকি সরকারও

বিভিন্ন আইনপ্রণয়নের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়িত করতে আজ সচেষ্ট। কিন্তু সভ্যতার যে প্রান্তে দাঁড়িয়ে আজ নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলা হচ্ছে তার বহুপূর্বে ঋষির মননে বিরাজিত এই সাম্যের অধিকার। আমরা বলছি, সেই ঋষির কথা যিনি সর্বকালের আধুনিক ব্যক্তিত্ব, যাঁর আধুনিকতার পরিচয় বহন করে তাঁর মহাকাব্যের ঘটনাপ্রবাহ, চরিত্রগুলির আচরণ ও চিন্তাধারা। তিনি হলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

কোন দেশের তথা সভ্যতার ইতিহাস, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে জানার অন্যতম উপাদান হল সেই দেশের সাহিত্য। সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ। সমাজে ঘটে চলা সমস্ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন প্রতিবিম্বিত হয় এই দর্পণে। কবি নিজের কল্পনার তুলিতে চরিত্রগুলিকে চিত্রিত করলেও তার ভিত্তি হয় তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট। দুই ঋষিকবির দুই অমর মহাকাব্যের মধ্যে মহাভারতের স্রষ্টা কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস। ভরতবংশীয় রাজাদের কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছে মহাভারতে। ব্যাসদেব নিজে তাঁর মহাকাব্যের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন –

''ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রাচিৎ''।। মহাভারত, ১/২/৩৯০

'পুরুষার্থ' অর্থাৎ যার জন্য মানুষের সমস্ত কার্যকলাপ নির্ধারিত। জীবনের মার্গনির্ধারক চারটি উপায়ের কথাই মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে বলে বলা হয় - যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে। সেই কারণে মহাভারতীয় সমাজ ও চরিত্রে এত বৈচিত্র্য। রামায়ণ এবং মহাভারতের মধ্যে মহাভারতের চরিত্রগুলি অপেক্ষাকৃত জটিল। তারা একবর্ণ তথা একঘেঁয়ে নয়। সেখানে চরিত্রগুলির মধ্যে মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটাতে গিয়ে কোথাও তাদের দেবত্বে উন্নীত করা হয়নি। মহাভারতকার তাঁর চরিত্রগুলিকে খুব সাধারণ রেখেছেন। সুখ-দুঃখ, ঈর্ষা, ক্ষোভ, করুণা, বাৎসল্য প্রভৃতি সাধারণ মানবিক অনুভূতিগুলি দিয়ে ব্যাস রাঙিয়েছেন তাদের। আমাদের জীবনের বাহ্যিক ও মানসিক দ্বন্দ্বগুলির সমস্তই দেখতে পাওয়া যায় চরিত্রগুলিতে। তাই যখনই ফিরে দেখার প্রয়োজন হয় তখন আমরা খুব সহজেই হাত বাড়াই মহাভারতের দিকে। মহাভারতীয় সমাজের প্রসঙ্গ এলে বলতে হয় তৎকালীন সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হলেও তা কখনই ক্রুর ও নিষ্ঠুর ছিল না। নারীস্বাতন্ত্র্য সে সমাজে সমাদৃত ছিল। নিয়ম-কানুনের বেড়াজাল ততটাও কঠোর ছিল না। উপরন্তু অসবর্ণবিবাহ, গান্ধর্ববিবাহ, কালীনপুত্রের স্বীকৃতি, ক্ষেত্রজপুত্রের জন্ম, স্বয়ম্বরানারী ইত্যাদি সমাজের প্রচলিত ছিল, যা সমাজের ব্যাপকতাকেই দ্যোতিত করে। তৎসত্ত্বেও ভুলে গেলে চলবে না যে তখনও সমাজ পুরুষতান্ত্রিক। উক্ত সমস্ত পুরুষার্থেই নিবেদিত। এই পুরুষতন্ত্র মানুষকে বারবার বোঝাতে চেয়েছে যে প্রজননশক্তিই নারীর বড় শক্তি এবং এর মাধ্যমেই তারা সমাজের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে। এ যেন ক্ষমতা আয়ত্তীকরণের খেলা। কিন্তু ক্ষমতালাভ ও ভোগের এই খেলায় পুরুষ বুঝে উঠতে পারে না যে নারী কখন তাদের সমতুল হয়ে গেছে এবং পরোক্ষভাবে সমস্ত কার্য তাদের অঙ্গুলি নির্দেশনার অনুগামী হয়ে গেছে। মহাভারতের বহু এমন নারীচরিত্র আছে যারাঁ নিজেদের মনস্বীতা, তেজস্বীতা, পাতিব্রত প্রভৃতির জন্য বিশ্ববন্দিত। কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী কেউই অবলা নারী নন। তাঁরা সকলেই শাস্ত্রীয় ও লৌকিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ, রাজনীতিজ্ঞ এবং যথার্থ ক্ষত্রিয়া রমণী। তাঁরা প্রত্যেকেই ক্ষমতায়িত। কিন্ত তাঁদের মধ্যে এমন এক রমণীর কথা আমরা আলোচনা করব যিনি সবার থেকে আলাদা। তাঁর আত্মসচেতনতা, সিদ্ধান্তগ্রহণ, রাজনীতিজ্ঞান, কূটনীতিবুদ্ধি, দূরদর্শিতা, সত্যস্বীকারে কুণ্ঠাহীনতা, আধুনিক মানসিকতা ইত্যাদি সকলকে বিস্মিত করে। তিনি হলেন রাজমাতা সত্যবতী, সেই যুগের নারী ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বর্তমান নিবন্ধে সত্যবতীর জীবনী বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই যুগে নারী ক্ষমতায়নের চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে।

মৎস্যগন্ধা সত্যবতীকে মহাভারতের 'নায়ক' বললে এতোটুকুও অত্যুক্তি করা হবে না। যদিও এ কথা শুনলে নাট্যশাস্ত্রকারেরা খড়্গহস্ত হয়ে ধেয়ে আসবেন। কারণ নায়ক হওয়ার অন্যতম অত্যাবশ্যক গুণ হল পুরুষত্ব। আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে মহাকাব্যের লক্ষণে বলেছেন – 'সর্গবদ্ধো মহাকাব্যং তত্রৈক নায়কঃ সুরঃ।

সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ।।[২]

উক্ত লক্ষণে সদ্বংশ, ক্ষত্রিয়, ধীরোদাত্ত ইত্যাদি সমস্ত শব্দই পুংলিঙ্গে প্রযুক্ত, কারণ তারা নায়ক পদের বিশেষণ, যেটি নিজেও পুংলিঙ্গবাচক। সুতরাং শাস্ত্রীয় লক্ষণ অনুযায়ী নায়ক হবেন একজন পুরুষ। মহাকাব্যের ক্ষেত্রে এই নায়ক এক বা তার বেশিও হতে পারেন - একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা।[৩] কিন্তু পারিভাষিক লক্ষণকে সরিয়ে রেখে যদি আমরা শুধুমাত্র নায়ক শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে গুরুত্ব দিই তাহলে সত্যবতীকে নায়ক বলা যায়। নী ধাতুর সঙ্গে ণ্বুল্ প্রত্যয় যোগে উৎপন্ন নায়ক শব্দটি, যার আক্ষরিক অর্থ নেতা বা নিয়ন্তা। যিনি কাব্যের ঘটনাকে এগিয়ে

নিয়ে যান তিনিই নায়ক। সত্যবতীর চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তিনি নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রক। মহাভারতের অন্যান্য নারীরা নিজেদের প্রজ্ঞা, তেজস্বীতার পরিচয় দিলেও সকলেই মূল ঘটনাপ্রবাহে সীমায়িত। তাঁরা তাদের ভাগ্যকে স্বীকার করেই জীবনযুদ্ধে টিকে থেকেছেন। কিন্তু সত্যবতী ভাগ্যকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর চরিত্রটি না থাকলে মহাভারত হয়ত নিজের গতানুগতিক ছন্দে কোন এক রাজপরিবারের কাহিনী হয়েই থেকে যেত। মানুষের মনের জটিল মনস্তত্ত্বের সাক্ষী হয়ত হতো না মহাভারত। তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্ত মোড় ঘুরিয়েছে মহাভারতের মূল কাহিনীর। তাঁর সুতীক্ষ্ণ রাজনীতিজ্ঞান, কূটবুদ্ধি পরিচালিত করেছে কুরুবংশীয় বীরদের। সামান্যা নারী থেকে তিনি হয়ে উঠেছেন সম্রাজ্ঞী। সুতরাং যিনি মহাকাব্যের মূলকাহিনীকে পরিচালিত করেছেন তাঁকে নায়ক বলতে দ্বিধা কিসের?

মহাভারতে সত্যবতীর প্রথম আবির্ভাব ধীবররাজের কন্যারূপে। মৎস্যজীবী হওয়ার জন্য মৎস্যের সাহচর্যে তিনি মৎস্যগন্ধা। পিতার নির্দেশে খেয়া পারাপারের দায়িত্বভার তাঁর ওপর ন্যস্ত। ধীবররাজের পুত্রসন্তান না থাকায় পুত্রের দায়িত্ব কন্যা হয়ে তিনি নিজে পালন করেছেন। তৎকালীন সমাজে পিতার কর্মভার যে কন্যারাও বহন করত, তার সাক্ষ্য বহন করে এই ঘটনা। কন্যা সেই সমাজে অবগুণ্ঠনবতী ছিল না। সত্যবতী ছিলেন পরমা সুন্দরী। বলা হয়েছে - অতীবরূপসম্পন্নাং সিদ্ধানামপি কাঙ্ক্ষিতাম্।।[৪] তাঁর স্বর্গীয় রূপলাবণ্যে সত্যিই সিদ্ধজনের আকাঙ্খা জাগ্রত হল, মুগ্ধ হলেন এক তপস্বী। তাঁর গতানুগতিক জীবনের ছন্দপতন ঘটাতে তাঁর জীবনে এলেন পরাশর মুনি। মৎস্যগন্ধার রূপলাবণ্যে মোহিত হয়ে পরাশরের আদি ঋপু জেগে ওঠে এবং তিনি সুকৌশলে তাঁর সঙ্গ কামনা করেন। পরাশর ঋষি হওয়ায় তাকে সাধারণ পুরুষ থেকে উৎকর্ষতা প্রদানের জন্যই যেন এই কৌশলের আস্তরণ। তিনি সত্যবতী কে বললেন -

'তস্মাৎ বাসবি! ভদ্রংতে যাচে বংশকরং সুতম্।
সঙ্গমং মম, কল্যাণি! কুরুস্ব--ইতি অভিভাষতে। ।' মহাভারত, আদি, ৫৮/১১১।

বয়সে ও জ্ঞানে পিতৃতুল্য পরাশরের মুখে এইরূপ কথা নিশ্চয় অভিপ্রেত ছিল না তরুণীর কাছে। উপরন্তু 'বাসবি' অর্থাৎ বসুনন্দিনী সম্বোধন তাঁকে দিশেহারা করেছিল। ত্রিকালজ্ঞ পরাশর সত্যবতীকে জন্ম পরিচয় দিয়ে তাঁর সংশয় কাটাতে সাহায্য করেন। সত্যবতী জানতে পারেন যে তিনি আসলে রাজকুলোজাতা, ইন্দ্রসখা চেদিরাজ উপরিচর বসুর[৫] কন্যা। মৎস্যের রূপে অভিশপ্তা অপ্সরা অদ্রিকার গর্ভে তাঁর জন্ম। সন্তানপ্রসবের পর অভিশাপমুক্ত হয়ে অদ্রিকা স্বর্গরাজ্যে ফিরে যান। রাজা উপরিচরের কাছে দুটি শিশু আনীত হলে কন্যাসন্তানটিকে তিনি সেই ধীবরকে দান করেন। সেই থেকে তিনি মৎস্যগন্ধা। উদ্ভিন্নযৌবনা এক যুবতীর এহেন জন্মের সত্যতা উন্মোচন সত্যিই বেদনাদায়ক। সেদিন কি সত্যবতীর হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়নি? ওলটপালট হয়ে যায়নি তাঁর সত্তা? অভিমান পুঞ্জিভূত হয়নি কি মনের অতলে? কিন্তু পিতা পরিত্যক্তা সেই কন্যা অভিমানে ছলছলচোখে রচনা করে নিলেন নিজের ভাগ্য। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। পরাশরের মুখে নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎবাণী শুনে তিনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে যাননি। পরাশরের মিলনের প্রস্তাবে তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে বলেছেন -

সাব্রবীৎ পশ্য ভগবন্! পরপারে স্থিতানৃষীন্।
আবয়োর্দৃষ্টয়োরেভিঃ কথং নু স্যাৎ সমাগমঃ।। মহাভারত, আদি, ৫৮/১১২

তাঁর সঙ্কোচ নিবারিত করার জন্য পরাশরের দ্বারা সৃষ্ট হল কুয়াশার আস্তরণ। কানীন পুত্রলাভে তাঁর পালকপিতার নিন্দার বিষয়েও তিনি সচেতন ছিলেন।[৬] তাঁর এই সমস্ত বিবেচনা, তাঁর স্বনিয়ন্ত্রণ ও লৌকিকজ্ঞানের পরিচায়ক। তাঁর সমস্ত কুণ্ঠা দূর করে পুত্রজন্মের পরও কুমারী থাকার আশীর্বাদ দিয়ে পরাশর বলেন - 'মৎপ্রিয়ং কৃত্বা কন্যৈব ত্বং ভবিষ্যসি'। পরাশর ও সত্যবতীর মিলনে জন্ম নিলেন মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব।[৭] সেই দিব্যবালক জন্মমাত্রেই বয়ঃপ্রাপ্ত হন এবং তপস্যার্থে পিতার সঙ্গে চলে যান। যাবার সময় গর্ভধারিণী মাকে স্মরণমাত্রে দর্শন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান - 'স্মৃতোঽহং দর্শয়িষ্যামি কৃতেষ্বিতি চ সোঽব্রবীৎ'। পরাশরের প্রিয়কার্য সম্পাদনের জন্য তাঁর আশীর্বাদে মৎস্যগন্ধার দেহ সুগন্ধময় হল, তিনি গন্ধবতী নামে খ্যাত হলেন। এক যোজন দূর থেকেও তাঁর সুগন্ধ অনুভূত হওয়ায় তিনি হলেন যোজনগন্ধা। নিজের জীবনের প্রতিকূলতাকে দূর করে তার এটি প্রথম জয়। জীবনের সত্যকে স্বীকার করে নিজের দুর্বলতাকে জয় করে এগিয়ে যাওয়ার জন্যই তিনি অসামান্যা।

পরবর্তীতে এই যোজনগন্ধার সৌরভে আকৃষ্ট হন স্ত্রী পরিত্যক্ত বনবাসী শান্তনু, তৎকালীন কুরুসাম্রাজ্যের মহারাজ। প্রথমে সুবাসের টানে ও পরে সত্যবতীর রূপে মোহিত হয়ে শান্তনু সত্যবতীর প্রতি আসক্ত হন এবং ধীবররাজের

কাছে সত্যবতীর পাণিপ্রার্থী হন। কিন্তু এই পরিণয়ে আরোপিত হয় শর্ত। পৃথিবীর সমস্ত পিতাই নিজের কন্যার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে চান। সেই একই চিন্তায় উদ্বিগ্ন ছিলেন ধীবররাজ। তাই নিজের পালিতা কন্যা ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভূতা সত্যবতীর জন্য স্বয়ং হস্তিনাপুরের মহারাজ শান্তনু পাণিপ্রার্থী হলেও বিবাহে আরোপিত হয় শর্ত। ধীবররাজ শান্তনুকে শর্ত দেন যে যদি সত্যবতীর গর্ভজাত সন্তান কুরুরাজ্যের যুবরাজ হন তবেই এই বিবাহ সম্ভব। এ যেন সত্যবতীর মনের অভিপ্রায়। পরাশরের দ্বারা নিজের জন্মবৃত্তান্ত জেনে নিজের না পাওয়া অধিকার, ক্ষমতা প্রভৃতি যেন তাকে প্ররোচিত করেছিল এ হেন শর্ত আরোপে। কিন্তু এই শর্ত শান্তনুকে মানসিক দ্বন্দ্বে ফেলে। একদিকে গঙ্গাপুত্র দেবব্রত, যাঁর পরাক্রম, বিদগ্ধতা কুরুরাজ্যকে মুগ্ধ করেছে এবং কুরুসিংহাসন যেন তাঁর জন্যই অপেক্ষারত। আর অন্যদিকে সত্যবতীর প্রতি তাঁর দুর্দমনীয় বাসনা, যাকে তিনি কোনভাবেই সংযত করতে পারছেন না। পিতার এই মানসিক অস্থিরতা দূর করতে এগিয়ে আসেন দেবব্রত। তারপর ঘটে সেই ঘটনা যা কুরুবংশের ভবিষ্যৎকে অন্য পথে পরিচালিত করে। পিতার কষ্ট দূর করতে এবং ভাবী মায়ের মনোবাসনা পূর্ণ করতে দেবব্রত নিলেন আজীবন ব্রহ্মচর্য্যের ভীষণ প্রতিজ্ঞা -

'রাজ্যং তাবৎপূর্বমেবং ময়া ত্যক্তং নরাধিপ।
অপত্যেহেতোরপি চ করোম্যেষ বিনিশ্চয়ম্।।
অদ্য প্রভৃতি মে দাশ ব্রহ্মচর্যং ভবিষ্যতি।
অপুত্রস্যামি মে লোকা ভবিষ্যন্ত্যক্ষয়া দিবি।' আদিপর্ব ৯৪/৮৭-৮৮

এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার ফলে দেবব্রত পরিণত হলেন ভীষ্মে এবং শুরু হল মহাভারতের নতুন অধ্যায়, যার লাগাম সত্যবতীর হাতে। যে নারীশরীর নারীর দুর্বলতা বলে সমাজ মনে করে, যে শরীরকে ভোগ করতে চেয়ে পুরুষ নারীর অবমাননা করে, সেই লাস্যের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে রাজনীতি।

হস্তিনাপুরের রাজমহিষীরূপে সত্যবতী বিরাজিতা হলেন। বেশ কিছুকাল সত্যবতী সম্রাজ্ঞী হয়ে নিজের আধিপত্য শান্তনু ও হস্তিনাপুরের ওপর বিস্তার করলেন। জন্ম হল চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, ঘটল শান্তনুর জীবনাবসান। রাজমাতা সত্যবতীর অনুমতি নিয়ে ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। চিত্রাঙ্গদ সিংহাসনে বসলেও ভীষ্মের মাধ্যমে রাজমাতা সত্যবতীই রাজ্যের রাজা। এই প্রেক্ষিতে তাঁর কূটনৈতিক বুদ্ধির প্রশংসা না করলেই নয়। ভীষ্মের সামর্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল সত্যবতী ভীষ্মকে কাজে লাগিয়ে পরোক্ষে রাজত্ব করতে থাকেন ও সমস্ত ক্ষমতার মধ্যমণি হয়ে অবস্থান করেন। চিত্রাঙ্গদ ছিলেন অতিশয় বলশালী ও দাম্ভীক। তিনি মানুষ, দেবতা, গান্ধর্ব, অসুর সকলকেই নিজের তুলনায় নিকৃষ্ট জ্ঞান করতেন। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মত্ত চিত্রাঙ্গদ একদা সমনামযুক্ত এক গান্ধর্বকে যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং গান্ধর্বের হাতে প্রাণ হারান। জ্যেষ্ঠভ্রাতার অবর্তমানে রাজা হন অপ্রাপ্তযৌবন বিচিত্রবীর্য। বিচিত্রবীর্যের হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করেন স্বয়ং ভীষ্ম সত্যবতীর মতানুসারে। বিচিত্রবীর্য যৌবনলাভ করলে রাজ্যের উত্তরাধিকারী লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর বিবাহের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় ভীষ্মেরই ওপর। ভীষ্ম যে কুরুবংশের প্রকৃত হিতাকাঙ্খী ও বিচিত্রবীর্যের পাত্রী নির্বাচনের জন্য আদর্শ ব্যক্তি সেই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। এটি তাঁর বিচক্ষণতার পরিচায়ক। সুযোগ্য শাসক হওয়ার যথাযোগ্য এক বীর যোদ্ধার জীবনও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এক রমণীর দ্বারা। যে বাসনা নিয়ে তিনি শান্তনুর প্রণয়ের ও পরিণয়ের আবেদনকে স্বীকৃতি দিয়ে কুরুসাম্রাজ্যের মহারাণী হয়েছিলেন, সেই বাসনা আজ যেন পূর্ণ হল।

বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম কণিষ্ঠ ভ্রাতার ভাবীবধূদের ভগিনীজ্ঞানে সসম্মানে হস্তিনাপুরে নিয়ে এলে কাশিরাজের দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে বিবাহ হয় বিচিত্রবীর্যের। বিচিত্রবীর্য ছিলেন অতিমাত্রায় তাঁর স্ত্রীদের প্রতি অনুরক্ত। অসংযত জীবনযাপন অল্পদিনেই প্রাণ নেয় বিচিত্রবীর্যের। যক্ষারোগ নির্বাপিত করল কুরুবংশের শেষ প্রদীপটিকে। যে সত্যবতী নিজের সন্তানকে সম্রাট করার জন্য ভীষ্মের মতো যোগ্য উত্তরাধিকারীকে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করে নিজের সন্তানের রাজ্যাভিষেক নিষ্কণ্টক করেছিলেন, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে তিনি হলেন সন্তানহীন, কুরুরাজ্য রাজাহীন। সেই মুহূর্তে সত্যবতীর অন্তরটা কি ছারখার হয়ে যায়নি? সমস্ত পেয়েও সব হারানোর শোক কি তার সত্তাকে ছিন্নভিন্ন করেনি? সাধারণ মানবী হলে হয়তো শোকে নিমজ্জিত হয়েই অতিবাহিত করতেন অবশিষ্ট জীবন। কিন্তু সত্যবতী যে অনন্যা। তাই সেই নিদারুণ পরিস্থিতিতে তাঁর মধ্যে রাজমাতার কর্তব্যবোধ সদাজাগ্রত। তাঁর রাজ্য যে আজ অভিভাবকহীন। চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর বিচিত্রবীর্যের অস্তিত্ব থাকাই পরিস্থিতিকে কোন দিকে নিয়ে যেতে হবে তা ছিল সত্যবতীর জানা। কিন্তু এখন সেই সম্বলটুকুও নেই। কুরুসিংহাসনের উত্তরাধিকারী কোথায়?

এত কিছুর পরও সত্যবতীর চারিত্রিক দৃঢ়তা কমেনি। তিনি এমন এক সিদ্ধান্ত নিলেন যা আজকের সমাজের অনেক আধুনিক নারীর পক্ষেও গ্রহণ করা হয়তো দুষ্কর। সেটি হল নিয়োগপ্রথার মাধ্যমে তাঁর পুত্রবধূদের গর্ভে ক্ষেত্রজ সন্তানের উৎপত্তি।[৮] প্রথমে তিনি শান্তনুপুত্র বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে এই প্রস্তাব দেন। ভীষ্ম সেই প্রস্তাবে রাজি না হলে তাঁকে স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হতে এবং বিবাহের মাধ্যমে বংশরক্ষা করে পিতৃপুরুষগণকে নরক থেকে উদ্ধার করার জন্য অনুরোধ করেন। যে সত্যবতী নিজের ভাবী সন্তানের অধিকার নিষ্কণ্টক করতে একদা শর্ত আরোপের মাধ্যমে দেবব্রতকে আজীবন ব্রহ্মচর্যব্রত পালনে বাধ্য করেছিলেন সেই তিনিই আজ ভীষ্মকে তাঁর ভীষণ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করে বিবাহ করতে অনুরোধ করছেন। এ কেমন চারিত্রিক বৈপরীত্য? কেন তিনি নিজের পূর্বকৃত সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে চাইলেন? এর কারণ হল তাঁর পরিণত মানসিকতা। শান্তনুর কাছে শর্তারোপের সময় তিনি ছিলেন যুবতী, তাই নিজের ও নিজের সন্তানের স্বার্থসংরক্ষণ ছিল তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আজ তিনি রাজমাতা। রাজ্যের তথা রাজ্যবাসীর স্বার্থচিন্তা যে তাঁরই কর্তব্য। অথবা দীর্ঘ সময়কাল ধরে ভীষ্মের বীরত্ব, আত্মত্যাগ, বৈমাত্রেয় ভায়েদের প্রতি অনসূয়া, কর্তব্যে অবিচলতা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করে তিনি কি সেদিন অনুতপ্ত হয়েছিলেন নিজের পূর্বের আচরণের জন্য? এই আত্মিক উন্নতি আবশ্যই কাম্য একজন ক্ষমতায়িত নারীর জীবনে। জীবনের অভিজ্ঞতায় স্নাত হয়ে যেন সত্যবতীর সমস্ত সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা চলে গিয়েছিল। আজীবন ব্রহ্মচর্যের ব্রতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভীষ্ম তাঁর কোন প্রস্তাবেই রাজি হলেন না। ভীষ্ম বিভিন্ন দৃষ্টান্ত সহকারে কোন গুণবান ব্রাহ্মণকে নিয়োগপ্রক্রিয়ায় নিযুক্ত করতে পরামর্শ দেন। তখন তিনি তাঁর কানীনপুত্র[৯] ব্যাসদেবকে স্মরণ করেন। সত্যবতী ছিলেন সকল প্রকার সংস্কারমুক্ত। সেই কারণেই ভীষ্মের সামনে নিজের কানীনপুত্রের কথা সঙ্কোচহীনভাবে বলেন। এখানেই মহাভারতের অন্যান্য নারীর থেকে তাঁর পার্থক্য। আমরা পাণ্ডবজননী কুন্তীকে তাঁর কানীনপুত্র কর্ণের কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠান্বিত হতে দেখেছি। কিন্তু সত্যবতী স্পষ্টবাদিনী। কুরুবংশকে রক্ষা করাই তখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। মায়ের কাছে পূর্বপ্রতিশ্রুত ব্যাসদেব মায়ের আদেশে অম্বিকা ও অম্বালিকার সাথে মিলিত হতে সম্মত হন এবং বধূদের একবছর ব্রতপালনের বিধান দেন। ব্যাস জানতেন ব্রতপয়ালন ব্যতীত তাঁর ভীষণ আকৃতি সহ্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কুরুরাজ্য তখন অভিভাবকহীন। তাই সত্যবতী সময়নষ্ট না করে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। জন্ম হয় ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর। ব্যাসের আশঙ্কা সত্য হয়। নিয়োগকালে ব্যাসের ভয়ঙ্কররূপ সহ্য না করতে পেরে অম্বিকা চোখ বন্ধ করে নেওয়ার জন্য তার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র হন জন্মান্ধ ও অম্বালিকা ভয়ে বিবর্ণ হওয়ায় তার পুত্র হয় পাণ্ডুর বর্ণ। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হওয়ায় রাজা হলেন পাণ্ডু। কুরু রাজ্যকে শক্তিশালী করার জন্য সত্যবতী ভীষ্মের সহায়তায় দুই পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিলেন শতপুত্রের জননী হওয়ার আশীর্বাদলব্ধা গান্ধারী ও দুর্বাসার আশীর্বাদলব্ধা কুন্তীর। পাণ্ডুর দ্বিতীয় বিবাহ হয় মাদ্রির সঙ্গে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজমাতার জীবন যখন সুস্থির ঠিক তখনই পাণ্ডু অভিশপ্ত হয়ে বনবাসে যান এবং কিছুকাল পরে তার মৃত্যু সংবাদ আসে। এবার ভেঙ্গে পড়লেন সত্যবতী। বাল্যদশাতে পিতা পরিত্যক্তা সত্যবতী সমাজের সঙ্গে লড়াই করে যেন তার পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কুরুরাজ্যকে দৃঢ়তার সঙ্গে সামলে রেখেছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। সমস্ত উত্থানেরই তো পতন ঘটে। এটি কালের নিয়ম। তাই ব্যাসের পরামর্শে সত্যবতী দুই পুত্রবধূর সঙ্গে বাণপ্রস্থে যান এবং সেখানেই দেহত্যাগ করেন।

হারিয়ে গেলেন সত্যবতী ইতিহাসের পাতায়। তিনি নারীধর্ম ও রাজধর্মকে কখনো মিশিয়ে ফেলেননি। রাজকার্য পরিচালনার জন্য যে কৌশলী বুদ্ধির প্রয়োজন তার সমস্তই যথেষ্ট পরিমাণে ছিল তাঁর মধ্যে। রাজমাতা হিসাবে তিনি যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার সবগুলি পূর্ণমাত্রায় সঠিক ফলপ্রসু না হলেও তাঁর সদিচ্ছা ও দৃঢ়প্রত্যয়ের প্রসংশা না করলেই নয়। মহাভারতের অনেক পুরুষকে দেখা যায় যে তাঁরা ক্ষেত্রবিশেষে মোহগ্রস্ত হয়েছেন, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছেন। কিন্তু সত্যবতী তাঁর অভীষ্টপ্রাপ্তিতে অবিচলিত, রাজমাতার কর্তব্যপালনে সদানিবেদিতপ্রাণ। বর্তমানে নারী ক্ষমতায়ন বা নারী সশক্তিকরণের জন্য সাধারণ মানুষ যেমন সচেতন তেমনি ভারতবর্ষের সুদূর অতীতে ঋষির মননে সেই চিন্তার বীজ নিহিত ছিল। তাই সত্যবতীর মতো দৃঢ় চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন, যে নিজের আত্মসম্মান, অধিকার, কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন। মহাভারতের মার্গনির্দেশকরূপে কৃষ্ণের নাম উচ্চারিত হলেও সত্যবতীর প্রভাব কি উপেক্ষণীয়? কাব্যের ক্ষুদ্র পরিসরে অবস্থান করেও সিংহভাগজুড়ে থাকা অনেকের থেকে তাঁর গুরুত্ব কি কোন অংশে কম? তবুও কতজন জানে সত্যবতীর কথা? হয়তো নারী হওয়াটাই তার প্রতি উদাসীনতার কারণ। আজকের যুগেও সত্যবতীর মতো বহু নারী সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা, পারদর্শিতা প্রমাণ করে চলেছেন। কোথাও তারা

স্বীকৃতি পাচ্ছেন, কোথাও হারিয়ে যাচ্ছেন আজীবন সংগ্রাম করে। তাদের এই হারিয়ে যাওয়াটাকেই আটকানো প্রয়োজন। না হলে আজ থেকে হাজার বছর পরও নারীর ক্ষমতায়ন নিছক একটি বিষয়রূপেই থেকে যাবে।

তথ্যসূত্র:

১। Asia and Pacific Centre for Women and Development ক্ষমতায়নের ব্যাখ্যায় বলেছে— "Empowerment is a process by which the conditions for self-determination of a particular people or group can be created".

২। দ্রষ্টব্য সাহিত্যদর্পণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ ১৬৮।

৩। দ্রষ্টব্য সাহিত্যদর্পণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ ১৬৮।

৪। দ্রষ্টব্য মহাভারত, আদিপর্ব, ৫৮/৮৪।

৫। পুরুবংশীয় এই রাজা ইন্দ্রের সখা। তিনি ছিলেন বসু অর্থাৎ পৃথিবীর অধিপতি। তাই স্বয়ং ইন্দ্র তাঁকে উপরিচর বসু নাম দিয়েছিলেন। তিনি ইন্দ্রদত্ত স্ফটিকনির্মিত বিমানে চড়ে নগরীর উপরে বিচরণ করতেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল উপরিচর রাজা।

৬। বিদ্ধি মাং ভগবন্! কন্যাং সদা পিতৃবশানুগাম্।/ত্বৎসংযোগাৎ চ দূষ্যেত কন্যাভাবো মমানঘ!।। আদি, ৫৮/১১৫

৭। গাত্রবর্ণ কালো হওয়ার জন্য তিনি 'কৃষ্ণ', যমুনার দ্বীপে স্থাপিত হওয়ায় তিনি 'দ্বৈপায়ন' এবং পরবর্তীতে বেদকে বিভক্ত করায় তিনি 'বেদব্যাস'।

৮। সন্তান উৎপাদনে অসমর্থ হলে কোন কোন পুরুষ নিজের স্ত্রীর সঙ্গে অন্য পুরুষের মিলনে পুত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যু হলে অপুত্রা নারী বংশলোপের ভয়ে কোন উত্তম পুরুষের সহযোগে গর্ভধারণ করতেন। এই পদ্ধতির নাম 'নিয়োগপদ্ধতি' এবং এর মাধ্যমে উৎপন্ন সন্তানকে বলা হত 'ক্ষেত্রজ সন্তান'। এক্ষেত্রে পিতৃপরিচয় প্রার্থীর বংশানুযায়ি হত।

৯। কুমারী কন্যার গর্ভজাত সন্তান।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়চন্দ্র. *সাহিত্য দর্পণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ,* সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১১

২। ভট্টাচার্য, ধীরেশচন্দ্র. *মহাভারতের একশোটি দুর্লভ মুহূর্ত,* আনন্দ, কলকাতা, ২০০৭

৩। ভট্টাচার্য, সুখময়. *মহাভারতের সমাজ,* বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, শান্তিনিকেতন, ২০০৬

৪। ভট্টাচার্য, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ. *মহাভারতম্, আদিপর্ব দ্বিতীয় খণ্ড,* বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ

৫। বসু, রাজশেখর (সারানুবাদ). *কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত,* মলয় প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ